শব্দালঙ্কার

আমাদের কাব্যশাস্ত্রকারগণ কাব্যের দুটি প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করেছেন দুটি বিশেষণের সাহায্যে—দৃশ্য আর শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য নাটক; শ্রব্য কাব্য রামায়ণ মেঘদূত মেঘনাদবধ সোনার তরী। শ্রব্যত্বই যে কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যরসিকগণও তা স্বীকার করেন। খ্যাতিমান্ কবিসমালোচক Alfred Noyes বলছেন, "…it (The Poetry Society of London) has been rendering a great service to the cause of poetry for many years now. It has helped people to realize that *poetry was meant to be heard*" (*The Poetry Review*, March-April, 1933)।

কাব্য রসাত্মক বাক্য। বাক্য পূর্ণ ভাবের প্রকাশক পদসমুচ্চয়। বাক্যকে যদি পরিবার বলি, পদকে বলতে হয় তার পরিজন। বহু বাক্য নিয়েও যেমন কবিতা হয়, একটিমাত্র বাক্যেও তেমনি নিটোল একখানি রসোত্তীর্ণ কবিতার সৃষ্টি হ'তে পারে। শেষোক্ত লক্ষণের অজস্র কবিতা রয়েছে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে; বাঙলাতেও রয়েছে এর অনেকগুলি নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' আর 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে।

বাক্যপরিবারের পরিজন যে পদ, তার দুটি রূপ—একটি বর্ণময় দেহরূপ, অন্যটি অর্থময় চিদ্-রূপ। প্রথমটির আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির বোধের কাছে—একটি concrete, অপরটি abstract।

দেহরূপটিকে কান দিয়ে দেখাই সার্থক দেখা—ধ্বনির (sound) মধ্যে যে রূপের আলো থাকে তার দ্রষ্টা চোখ নয়, মন। কবি 'ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি' দান করেন এই ধ্বনিকে, প্রসাধনে মণ্ডিত করেন এই ধ্বনিকে।

শব্দালঙ্কার প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির অলঙ্কার। ধ্বনি আবার বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাও বা বাক্যধ্বনি। শব্দালঙ্কারের শব্দ, সূক্ষ্ম বিচারে, word নয়। বর্ণধ্বনি অনুপ্রাসে, পদধ্বনি যমক বক্রোক্তি শ্লেষ পুনরুক্তবদাভাসে, বাক্যধ্বনি সর্ব্বযমকে। যথাস্থানে এদের ব্যাখ্যা করব এবং বাঙলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে এদের নানানতর প্রকারভেদ যুক্তি দিয়ে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করব।

কেউ হয়তো বলবেন, 'শব্দ' মানে ধ্বনি শুধু অনুপ্রাস-সম্পর্কেই বলা চলে ; যমক শ্লেষ ইত্যাদির বেলায় শব্দ মানে word বলব না কেন ?

বলতে আমিও তো নিষেধ করি নাই। শব্দ মানে word না ধরলে 'পদধ্বনি' 'বাক্যধ্বনি' লেখা তো আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। যমক শ্লেষ ইত্যাদিতে অর্থেরও চরম মর্য্যাদা—অর্থ বাদ দিলে এসব অলঙ্কারের অস্তিত্বই থাকবে না, শুধু অনুপ্রাসই থাকবে একমাত্র শব্দালঙ্কার হ'য়ে। তবু এরা অর্থালঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হ'য়ে যাবে। অর্থালঙ্কারে শব্দের (word-এর) অর্থটাই সর্ব্বস্ব ; শব্দালঙ্কারে অর্থের দিকটা নিতান্তই গৌণ। শব্দ এখানে word সত্য ; কিন্তু শব্দের বিশেষবর্ণসমাবেশময় গঠনরূপটাই চরম সত্য। এই গঠনরূপে বর্ণাবলীর মিলিত যে ধ্বনি (sound), সেইটিই অলঙ্কারের নিয়ন্তা। দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক—

মধুসূদনের

"কেন গর্ব্বী **কর্ণে** তুমি **কর্ণ**-দান কর,
রাজেন্দ্র ?"

প্রেমেন্দ্রের

"কোন্ সে বধূর বুকের আগুন ভিতর করিয়া থাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার পুড়ে গেল **সাতপাক**।"

প্রথমটিতে **'কর্ণ' 'কর্ণ'**—অলঙ্কার **যমক**। 'সেনাপতি কর্ণ' আর 'কান' এদের যথাক্রমিক অর্থ (অহঙ্কারী কর্ণের কথা শোন কেন ?)। প্রথম 'কর্ণ'-কে 'সূতপুত্র' অথবা দ্বিতীয় 'কর্ণ'-কে 'কান' বা 'শ্রুতি' করলে আর যমক থাকে না। অলঙ্কার রাখতে হ'লে 'কর্ণ-কর্ণ' রাখতেই হবে। অর্থের সঙ্গে যেটি চাই-ই চাই সেটি হচ্ছে 'কর্ণ' বর্ণকয়টির ধ্বনির যথাযথ দ্বিরাবৃত্তি। প্রেমেন্দ্রের কবিতাংশটিতে **'সাতপাক'** কথাটিতে **শ্লেষ** অলঙ্কার। এটি word তো নিশ্চয়ই ; কিন্তু এর অর্থ বজায় রেখে একে যদি সাতপ্যাঁচ, সপ্তবেষ্টনী-গোছের চেহারা দেওয়া যায় তাহ'লে শাড়ীর সাতটা পাক ঠিকই থাকবে, কিন্তু বিবাহ অর্থটা অন্তর্ধান করবে এবং শ্লেষ অলঙ্কার বরণ করবে অপমৃত্যু। মূল্য তাহ'লে কোন্‌টার বেশী হ'ল ?—অর্থের ? না, বিশেষধ্বনিমান্ **সা-ত-পা-ক** বর্ণাবলীর ?

শব্দালঙ্কার শব্দপরিবর্ত্তন সইতে পারে না, অর্থালঙ্কার পারে। এইখানেই দুইয়ের পার্থক্য ('অর্থালঙ্কার' দ্রষ্টব্য)।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে **অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, (শব্দ-) শ্লেষ** এবং **পুনরুক্তবদাভাসই** প্রধান। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও অনুপ্রাসের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী ; এর নীচেই বক্রোক্তি আর শ্লেষ ; তৃতীয় স্থান যমকের এবং চতুর্থ পুনরুক্তবদাভাসের।

আগেই বলেছি শব্দপরিবর্ত্তনে শব্দালঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে না।

১। অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ, যুক্তভাবেই হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক, একাধিক-বার ধ্বনিত হ'লে হয় **অনুপ্রাস**।

বর্ণ=ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ নয়। যে বর্ণের বা বর্ণগুচ্ছের অনুপ্রাস হবে, তাদের সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনি বিষম অর্থাৎ বিভিন্ন হ'লেও অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকবে ("অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং **বৈষম্যেঽপি** স্বরস্য যৎ"—সাহিত্যদর্পণ)। 'শব্দসাম্য' কথাটার অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিসাম্য। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সম্মান নাই। দুইএকটা উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে :

(i) "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—প্রথম পঙ্‌ক্তিতে **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **চারবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'উ'-ধ্বনি ; সুতরাং ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনিরও ঘটেছে সমতা। পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদুটিতেও এই অবস্থা : **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **আটবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'অ'-ধ্বনি ; সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জন দুইয়েরই ধ্বনিসাম্য। আবার সমগ্রভাবে তিনটি পঙ্‌ক্তিতে **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **বারোবার**। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে স্বরধ্বনি **'উ'**, দ্বিতীয়-তৃতীয়ে **'অ'** ; সুতরাং স্বরধ্বনি **বিষম**। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনির সাম্য হ'ল কি বৈষম্য হ'ল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃতিটির অলঙ্কারনির্ণয়ে শুধু এই কথাটি বলতে হবে যে **এখানে 'গ'-ধ্বনির অনুপ্রাস, ধ্বনিটি বারোবার আবৃত্ত হয়েছে।**

(ii) "কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত"—রবীন্দ্রনাথ।

—চারবার আবৃত্ত 'ক'-ধ্বনির অনুপ্রাস।

(iii) 'স্বর্ণোজ্জ্বলবর্ণা, তোমার কর্ণে দুলিছে কর্ণিকার'—শ. চ.

—'র্ণো', 'র্ণা', 'র্ণে', 'র্ণি' ; কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমাদের অলঙ্কার চারবার আবৃত্ত **'র্ণ'** এই যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস।

অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনির সাম্যকে ইংরিজিতেও মূল্য দেওয়া হয় না।

শুদ্ধ স্বরধ্বনির সাদৃশ্যকে আমরা অনুপ্রাস বলি না, কারণ এক স্বর বার বার উচ্চারিত হ'লেও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না—"স্বরমাত্রসাদৃশ্যং তু বৈচিত্র্যাভাবাৎ ন গণিতম্" (বিশ্বনাথ)। এ যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত। ইংরিজিতে ভুল ক'রে স্বরবর্ণের অনুপ্রাস (Alliteration) বহুদিন ধ'রে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছিল। আজও উদাহরণরূপে

"Apt Alliteration's artful aid" বা
"An Austrian army awfully arrayed"

অনেকের বইয়ে দেখা যায়। অথচ ধ্বনির দিক্ থেকে 'a' কত বিসদৃশ—'a'= এ্যা, আ, এ, অ। এর চেয়ে শতগুণে ভালো

'আকুল আবেগে আমি আপনার আসার আশায় আছি'—শ. চ.

ধ্বনির দিক্ থেকে এটি নিখুঁত। তবু 'আ'-র অনুপ্রাস হয়েছে একথা বলব না। আধুনিক ইংরিজি কাব্যশাস্ত্রে স্বরের alliteration স্বীকার করা হয় না, হয় শুধু ব্যঞ্জনের—"*Alliteration* occurs when two or more syllables in close proximity commence with *the same consonant*", বলেছেন Smith।

একটা মূল্যবান্ প্রসঙ্গ :

একই স্বরধ্বনির বহুবার আবৃত্তি ক্ষেত্রবিশেষে অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল বিস্তার করে Onomatopœia বা 'ভাবধ্বনি'তে। কিন্তু Onomatopœia অনুপ্রাস নয়। এটিকে Figure-এর বা অলঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত করা ভুল, কারণ এর কোনো বাঁধা পথ নাই। একটা উদাহরণ দিই :

"স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্মবিদার রব।"—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে দীর্ঘায়ত 'আ'-ধ্বনি বার বার আবৃত্ত হ'য়ে করেছে বেদনার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। কিন্তু এই ব্যঞ্জনারহস্য শুধু নিরাকার 'আ'-ধ্বনির মধ্যেই নিহিত নয়।

বারংবার আবৃত্ত সাকার 'শষস'-ব্যঞ্জনধ্বনির শ্বাসব্যঞ্জনাকে আর শোকপ্রকাশ-দ্যোতক দ্বিরাবৃত্ত 'হ'-ধ্বনিকে সাহায্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছে ব'লেই 'আ'-ধ্বনির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা সম্ভবপর হয়েছে। একা 'আ'-ধ্বনি যে কত ব্যর্থ তা বোঝা যাবে যদি 'শষস' আর 'হহ' উড়িয়ে দিই :

'মূক রাজাগারে বেদনা-তিমির,
চিতাভূমে জাগা আনিছে সমীর
কত না অনাথা পুরকামিনীর
মর্ম্মবিদারী রব।'—শ. চ.

এখানেও তেরোটি আ-ধ্বনি রয়েছে, কিন্তু একান্ত মূল্যহীন এরা—না আছে অনুপ্রাস, না আছে Onomatopœia।

কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের

"ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা"

নজিররূপে দাঁড় করিয়ে বলেন, এই তো চমৎকার অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'ঐ', 'ঔ'; তাহ'লে মানি কেমন ক'রে যে স্বরধ্বনিতে অনুপ্রাস হয় না?

আমার উত্তর এই :

বাঙলায় স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘবিচার নাই; সব স্বরই হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রার। **শুধু মাত্রাচ্ছন্দের কবিতায়** 'ঐ' আর 'ঔ' এই দুটিমাত্র স্বর দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিকভাবে উচ্চারিত হয়। এরা 'আ, ঈ, ঊ, এ, ও'-র চেয়ে ওজনে ভারী, তার কারণ উচ্চারণে এরা দুই স্বরধ্বনির (মিলিত নয়) স্বল্পব্যবহিত রূপ —'ঐ'=অই বা ওই, 'ঔ'=অউ বা ওউ। স্বরবর্ণাবলীর মধ্যে এরা এইভাবে একটু ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ব'লে একপ্রকার বিশেষ ধ্বনিমূল্য এদের আছে।

মাত্রাচ্ছন্দেই রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রয়োগ করেছেন 'ঐ' 'ঔ'। এদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বহু গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনধ্বনি—ভ, হ, জ, ঘ, গ, ব, য; সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন 'ভ, জ, য, ত, র, ষ, স, ন'-র অনুপ্রাস। মেঘমেদুর বর্ষার ভাবব্যঞ্জনায় রচিত বহুবিচিত্র উপচার-উপকরণের নৈবেদ্যখানির অঙ্গীভূত হওয়ায় 'ঐ' আর 'ঔ' পাঠকমনে বিস্তার করে একপ্রকার মায়া—মাত্রাচ্ছন্দ ওই মায়াসৃষ্টির অবকাশ ঘটিয়েছে।

এই কবিতাংশটিকে তানপ্রধান পয়ারে রূপান্তরিত ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি

'ঐ' 'ঔ' একমাত্রিক হওয়ায় ধ্বনিগৌরব হারিয়ে কত গৌণভূমিতে নেমে এসেছে :

'ঐ আসে ঐ যে গো অতিভৈরব হরষে
সলিলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
জলদগৌরবে নবযৌবনা বরষা'—শ. চ.

এখানে **অনুপ্রাস হয় নাই** ; কারণ যে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকলে কান সুন্দর ব'লে তাকে বরণ ক'রে নেয়, 'ঐ' 'ঔ' এখানে মেরুদণ্ডহীন ব'লে সেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে নাই।

মনে হোয়, রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় 'ঐ' লিখেছিলেন 'ঐ'কারের সম্ভাব্য অনুপ্রাসনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণের বাসনায়। মনে হওয়ার কারণ 'ওই' লেখাই রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস, সবরকম ছন্দে।

যাই হোক, **আমরা মাত্রাচ্ছন্দের কবিতায় 'ঐ' আর 'ঔ' স্বরধ্বনি-দুটির অনুপ্রাস স্বীকার করব**। রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটির মতন অনুকূল ধ্বনিপরিবেশ না থাকলেও 'ঐ' 'ঔ' আপন শক্তিতেই অনেকটা বৈচিত্র্য যে আনতে পারে তার প্রমাণ মিলবে নীচের কবিতাটিতে :

'ঐ ধেনু ল'য়ে হৈ হৈ রব করিয়া
পৌষের সাঁঝে মৌবনপথ ধরিয়া
রাখাল ফিরিছে, বৌ আসে জল ভরিয়া।'—শ. চ.

বাঙলা উচ্চারণ ও অনুপ্রাস

বাঙলাভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের অনুপ্রাসবিচার ঠিক সংস্কৃতনিয়মে চলে না। আমরা মুখে বলি বর্গীয় 'ব' **অন্তঃস্থ** 'ব', বর্গীয় 'জ' অন্তঃস্থ 'য', দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধন্য 'ণ', তালব্য 'শ' মূর্দ্ধন্য 'ষ' দন্ত্য 'স' ; কিন্তু উচ্চারণে আমাদের সকল 'জ'ই বর্গীয় (জল, যদি), সকল 'ব'ই বর্গীয় (বন্ধন, বচন), সকল 'ন'ই দন্ত্য (ধন্য, গণ্য), সকল 'শ'ই তালব্য (বি**শেষ**ণে **স**বি**শেষ**')। 'য'-কে 'জ' করেছি ; কিন্তু 'য'-র মূল সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙলায় যেখানে রাখতে হয়েছে, সেখানে এর তলায় ফুট্‌কি দিয়ে নতুন এক বর্ণ সৃষ্টি করেছি—নয়ন, প্রিয়। এইসব কারণে আমাদের অনুপ্রাসকে অনেকক্ষেত্রে চলতে হবে অ-সংস্কৃত অর্থাৎ খাঁটি বাঙলা পদ্ধতিতে।

দুইএকটা উদাহরণ দিই :

(i) 'দুঃশাসনের শোষণ-নাশন হে ভীষণ-দরশন'—শ. চ.

(ii) 'নববন্ধনে বাঁধিলে যে তুমি জননি'—শ. চ.

—(i) **বাঙলামতে** 'শ ষ স' সবই উচ্চারণে 'শ' (sh) এবং 'ণ ন' উচ্চারণে 'ন' (n) ব'লে সাতবার 'শ'-ধ্বনির এবং ছবার 'ন'-ধ্বনির অনুপ্রাস। **সংস্কৃত-মতে** এ উদাহরণে অনুপ্রাস-বিচার চলে **দুভাবে:** (১) উচ্চারণস্থান বিভিন্ন ব'লে 'শ ষ স' অথবা 'ণ ন' অনুপ্রাসের অধিকারে বঞ্চিত; বলতে হবে—চারবার 'শ', দুবার 'ষ', দুবার 'ণ' আর চারবার 'ন' অনুপ্রাসিত হয়েছে, 'স' প'ড়ে আছে একলা। (২) 'স ন' অনুপ্রাস উচ্চারণস্থান দন্ত ব'লে, 'ষ ণ' অনুপ্রাস উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা ব'লে—এর নাম 'শ্রুত্যনুপ্রাস'।

(ii) **বাঙলামতে** দুবার 'ব'-ধ্বনির অনুপ্রাস। **সংস্কৃতমতে** অনুপ্রাস নাই, কারণ 'নব'-র 'ব' অন্তঃস্থ, 'বন্ধনে'-র 'ব' বর্গীয়। **বাঙলামতে** 'জ য' অনুপ্রাস আমাদের উচ্চারণে এরা এক (j) ব'লে। **সংস্কৃতমতে**ও অনুপ্রাস 'জ য' একই স্থান (তালু) থেকে উচ্চারিত ব'লে—শ্রুত্যনুপ্রাস।

'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-র প্রথম সংস্করণে শ্রুত্যনুপ্রাস কেন বর্জ্জন করেছিলাম সংক্ষেপে তা একটু জানিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছে।

যে-সব ব্যঞ্জন একই স্থান থেকে উচ্চারিত তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম একপ্রকার ধ্বনিসাম্য অনুভূত হয়। এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্য-অনুভূতির ভিত্তিতে এইজাতীয় বর্ণধ্বনির অনুপ্রাস প্রাচীনদের কেউ কেউ স্বীকার করেছিলেন। এরই নাম শ্রুত্যনুপ্রাস; আচার্য্য দণ্ডী এর প্রবর্ত্তক, ভোজরাজ উৎসাহী সমর্থক, বিশ্বনাথ অদ্ভুত অনুবর্ত্তক—'অদ্ভুত' বললাম এই কারণে যে বিশ্বনাথ প্রাচীন ধারা থেকে স'রে এসে আমার অর্থাৎ বাঙালীর প্রায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। আচার্য্য দণ্ডীর উদাহরণ "এষ রাজা যদা লক্ষ্মীম্…"—তাঁর মতে 'ষ-র', 'জ-য', 'দ-ল' প্রত্যেক জোড়াটিতে শ্রুত্যনুপ্রাস; কারণ প্রথম জোড়াটির উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, দ্বিতীয়টির তালু এবং তৃতীয়টির দন্ত। আমরা কিন্তু একমাত্র 'জ-য' ছাড়া অন্য কোনো জোড়ায় বর্ণে বর্ণে ধ্বনিসাম্য শ্রুতি (কান) দিয়ে ধরতে পারি না। বিশ্বনাথেরও আমাদেরই মতন অবস্থা হয়েছে। তাঁর উদাহরণ "মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ"—তিনি বলছেন 'জ-য' শ্রুত্যনুপ্রাস; কিন্তু 'মনসিজ' কথাটিতে দন্ত হ'তে উচ্চারিত 'ন-স'-সম্বন্ধে তিনি নীরব। এর একমাত্র কারণ এই যে বাঙলার মতন ওড়িয়াতেও 'য' উচ্চারণে 'জ' ব'লে বিশ্বনাথের কান সহজেই এদের ধ্বনিসাম্য মেনে নিয়েছে, 'ন-স'-কে সমধ্বনি ব'লে স্বীকার করতে পারে নাই।

এ অবস্থায় শ্রুত্যনুপ্রাসকে বাঙলায় প্রাচীন সংজ্ঞা-অনুসারে গ্রহণ করার কোনো সার্থকতা দেখি না।

বাঙলা কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস একটি মূল্যবান্ শব্দালঙ্কার। সেখানে শ্রুত্যনুপ্রাস আমাদের উপকার করবে; কিন্তু তার সংজ্ঞা রচনা করব নতুন ক'রে।

বাঙলায় **অনুপ্রাস তিনরকম—অন্ত্য, বৃত্তি, ছেক**। এদের মধ্যে **বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ**, কারণ গদ্যপদ্যময় সাহিত্যে এর সার্ব্বভৌম অধিকার; মিত্রছন্দা কবিতার আনন্দলোকে 'চরণ-বিচরণ' অন্ত্যানুপ্রাসের। ছেক গৌণ। **শ্রুত্যনুপ্রাসকে আমরা গ্রহণ করছি শুধু অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারিরূপে; বাঙলায় এর স্বতন্ত্র আসন নাই।**

(ক) শ্রুত্যনুপ্রাস ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম **শ্রুত্যনুপ্রাস**।

ধ্বনির ঐক্য নয়, সাদৃশ্য অর্থাৎ 'ছন্দ-নন্দ'-র মতন ঠিক এক নয়, 'ছন্দ-বন্ধ'-র মতন একরকম। বাঙলায় 'ক' আর 'খ' সদৃশ ধ্বনি, 'গ' আর 'ঘ' সদৃশ ধ্বনি; তেমনি চ ছ, ট ঠ, ত থ, প ফ, জ ঝ, ড ঢ, দ ধ, ব ভ সদৃশ ধ্বনি। এইজাতীয় ধ্বনিসাদৃশ্য নিয়ে অজস্র অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন বাঙলার সকল যুগের কবিরা। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দিই—

ক খ ঃ পরপারে দেখি আঁ**কা** তরুছায়া মসীমা**খা**।
গ ঘ ঃ বাতাস বহে বে**গে**, ঝিলিক মারে মে**ঘে**।
চ ছ ঃ কালো চোখে আলো না**চে**, আমার যেমন **আছে**।
জ ঝ ঃ চিরদিন বা**জে** অন্তরমা**ঝে**।
ট ঠ ঃ ধরি তার কর দু**টি**, আদেশ পাইলে উ**ঠি**।
ত থ ঃ লীলাপদ্ম হা**তে**, কুরুবক মা**থে**।
দ ধ ঃ বাদী প্রতিবা**দী**, বিবিধ উপা**ধি**।
প ফ ঃ দিল সে এত কাল যা**পি**, হোলির দিনে কত কা**ফি**।
ব ভ ঃ কূল নাহি পাই তল পাব তো ত**বু**;
হতাশ মনে রইব না আর ক**ভু**।
('ড-ঢ'-র অন্ত্যানুপ্রাস বাঙলায় নানা কারণে দুর্লভ)

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে একস্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য সদৃশ ধ্বনি ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস, অতএব শ্রুত্যনুপ্রাস। উদাহরণগুলি